Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 1, January-June 2019
ISSN 2519-5816

মুঘল আমলে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা

সালমান*

Abstract : The arrival of the Mughals in india (1526) marked the beginning of a new era not only in socio-economic, political and military affairs but also in education and culture. In the two hundred years of the Mughal empire, the greatest improvement in every field of science and knowledge has not been possible without the Mughals in the history of the whole of India. The court of the Mughal emperors became the center of wise and virtuous people. Emperors have invited new educational methods and established new educational centers and universities to spread education. The education centers of the Mughal empire have been awaken by the status of students. During the Mughal rule, education programs were conducted all over India, such as Maktabs, Madrasahs, Mosques, Monasteries, private houses and Khankahs. Primary, secondary and higher education was completed at all three levels. Even though their education system was based on religion, all the contemporary topics were included in the text list. The students were not forced to choose the subjects in terms of their future thoughts. The language of education was Arabic and Persian. After completing education they were presented, conferred the title of Fazil, Alim, Qabil and awarded certificates. At that time education was completely unpaid and there was also enough stipends for the poor and talented students. As a result there was a competition among the students for acquiring knowledge. At that time there was a very sweet relationship between teachers and students. The relationship between them was like father and son. However, there was a punishment system for non-performing students. During the Mughal period, women`s education was not spread in the country due to strict veil system but elite families educated their women through the appointment of house teachers. Basically, the Mughals have been immortalized throughout the history of India for their advanced education system. The present article has been desighned to focus on the practice of education in Mughal Indian Muslims.

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, আর. কে. চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, সায়েদাবাদ, ঢাকা ও এম.ফিল গবেষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভূমিকা

মুঘলমানদের ভারত আগমন কেবলমাত্র আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। অবশ্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক এই ঐতিহ্য মুঘলমানরা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। শিক্ষা ও শিক্ষাবিস্তারকে মুঘলমানরা একটি পবিত্র কাজ ও আল্লাহর প্রতি অনুরাগের নিদর্শন বলে মনে করতেন। তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই মসজিদের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেছেন। মুঘল সম্রাটরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে মুঘল বিজয় মুঘলমান শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তাঁদের শাসনামলে ভারত উপমহাদেশ শিক্ষা ও সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল যুগে পরিণত হয়। উইলিয়াম হান্টার তার দি ইন্ডিয়ান মুঘলমানস গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, এ দেশটা আমাদের হুকুমাতে আসার আগে মুঘলমানরা শুধু শাসন ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল।[১] কেননা মুঘলরা শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং তাঁরা জ্ঞানের উন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। শুধু মুঘল সম্রাটগণই নন, যুবরাজরা, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং রাজকর্মচারীগণও উচ্চ শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন। সকলে শিক্ষার অবাধ পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তাঁদের দরবারসমূহ জ্ঞানী ও গুণি ব্যক্তিদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। প্রজাদের মধ্যে প্রাথমিক কিংবা পান্ডিত্যপূর্ণ শিক্ষা বিস্তারেও তাঁরা যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। এজন্য তাঁরা উদ্ভাবন করেছেন নতুন নতুন শিক্ষা পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠা করেছেন নব নব শিক্ষাকেন্দ্র। মুঘল সাম্রাজ্যের জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলো শিক্ষার্থীদের পদভারে হয়েছে প্রকম্পিত। মুঘল শিক্ষা ব্যবস্থা তাই গবেষকদের অতি প্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মুঘল শাসনামলে রচিত মৌলিক গ্রন্থাবলীতে তাঁদের রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক বিষয় সম্পর্কেই বেশি আলোচনা স্থান পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে মুঘল আমলে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস চালান হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

মুঘল শাসনামলে সমগ্র ভারতবর্ষে মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, মঠ, ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি, খানকাহ্ ও মাজার প্রভৃতি স্থান থেকে শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালিত হত। মসজিদের মত খানকাহ্গুলোও শিক্ষাস্থানে পরিণত হয়। এসময় মুসলিম শিক্ষার রীতি ছিল তিন ধরণের - ১. আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাঠক্রমসহ বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা, ২. মাধ্যমিক শিক্ষা যা উচ্চ বিদ্যালয় ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে লাভ করা যায় এবং ৩. মৌলিক জ্ঞানসহ প্রাথমিক শিক্ষা।[২] আলোচ্য প্রবন্ধে মুঘল যুগের মুসলিম জ্ঞান চর্চার ধারা- শিক্ষার কেন্দ্র, পাঠদান পদ্ধতি, পাঠ্যসূচি, বিষয় নির্বাচন, সময়সূচি, পুস্তকবিন্যাস, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার ভাষা, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, শাস্তির বিধান, শিক্ষার উদ্দেশ্য, বৃত্তি ব্যবস্থা, শ্রেণি কক্ষ, হস্ত লিখন পদ্ধতি, কারিগরি শিক্ষা, নারী শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। মুঘল শাসকদের রচিত আত্মজীবনী, হেরেমের নারীদের রচিত গ্রন্থ, দরবারী ঐতিহাসিকদের লিখিত বই, সমসাময়ীক পরিব্রাজকদের বিবরণী প্রভৃতি মুখ্য উৎসকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে আধুনিককালে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, জার্নাল ও ওয়েবসাইট প্রভৃতি সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণতঃ মক্তব কিংবা নিজ ঘরেই দেয়া হত। প্রত্যেক মসজিদ ও ইমামবাড়ার (শিয়াদের দ্বারা মুহর্‌রমের অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য নির্মিত ভবন বা সম্মেলন কক্ষ) সঙ্গে একটি করে মক্তব ছিল। প্রাথমিক স্তরে সহশিক্ষার প্রচলন ছিল। বালক-বালিকারা একত্রে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত এবং তাদের শিক্ষাদানের নিমিত্ত মসজিদের ইমাম ছিলেন শিক্ষক। ধর্মীয় শিক্ষাদানই ছিল প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি। বালক-বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেক মুঘলমান শিশু সন্তানকে ধর্মের মূলনীতিসমূহ ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হত। মুঘলমান ছেলে-মেয়েদেরকে মক্তবে নামাজ পড়া ও ওজু করা শেখানো হত। এখানে (মক্তব) সে (শিশু) কালেমা বা ধর্মমত ও কুরআন থেকে কিছুটা আয়াত মুখস্ত করত এবং এসব তার দৈনন্দিন নামাজের জন্য প্রয়োজন হত। কুরআন শরীফ মুখস্ত করাও একটা সাধারণ রীতি ছিল; এর সঙ্গে যুক্ত ছিল হাদিস বা রসুলের ঐতিহ্য (তদীয় হুকুম আহকাম) লিখন, পঠন ও অঙ্কন এবং ফার্সি ভাষা সুচারু লিখন পদ্ধতির চর্চা করা হত। তবে ধর্মীয় বিষয়াদি ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য শাখার অনুশীলনেরও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হত প্রাথমিক বদ্যিালয়ে।[৩] প্রাথমিক শিক্ষার একটি আবশ্যকীয় অংশ ছিল অঙ্কশাস্ত্র। অঙ্কশাস্ত্রের উপাদানগুলো যেমন– যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এবং জমির মাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাঠাকিয়া, গন্ডাকিয়া, কড়াকিয়া ও বিঘাকিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা দেওয়া হত। অঙ্কশাস্ত্রের পাঠ্য তালিকাভুক্ত একটি প্রধান অংশ ছিল শুভঙ্করী নামে অভিহিত শুভঙ্কর পদ্ধতি। উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও সে যুগের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পদার্থবিদ্যা এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহও শিক্ষা দেওয়া হত।[৪]

শিশুর ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন বয়স পূর্ণ হলেই "বিসমিল্লাহ খানী" পর্ব পালন করত অর্থাৎ ছেলেকে ওই দিন বিদ্যালয়ে (মক্তব) ভর্তি করা হত। জ্যোতিষ্ঠীর গুণে বলা নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে তার জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করত।[৫] এদিন অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হত। শিশুকে গোসল করিয়ে পরিষ্কার কাপড় পরানো হত। হয়ত এ উপলক্ষে নতুন পোশাক তৈরি করে দেয়া হত। স্থানীয় মসজিদের ইমাম বা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কোনো পূণ্যবান বা বয়োবৃদ্ধ লোক বা শিশুর জন্য মনোনীত শিক্ষককে অনুষ্ঠানের ভার দেওয়া হত। শিশুর জীবনে এ দিনটি একটি স্বরণীয় দিন বলে গণ্য হত। মনোনীত ব্যক্তি শিশুকে নিজের সামনে সাদরে বসাতেন। আত্মীয় হলে কোলে বসাতেন। তারপর বিসমিল্লাহ পড়ে কুরআন শরীফ থেকে একটি নির্বাচিত আয়াত স্পষ্ট কণ্ঠে ধীরে ধীরে পাঠ করতেন এবং শিশুকে তা পুনরাবৃত্তি করতে শিক্ষা দিতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাঠের ফলক বা দু' একটি আরবী হরফ খড়িমাটি দিয়ে লিখে শিশুর হাত ধরে তার ওপর হাত বুলানো হত। তারপর উপস্থিত সকলে শিশু যেন ভবিষ্যতে বিদ্যায় ও চরিত্রে পরিবার এবং দেশের মুখোজ্জ্বল করতে পারে তার জন্য দোয়া করতেন। কেউ কেউ শিশুর মুখে খৈ পুরে দিতেন, যাতে ভবিষ্যতে তার মুখ থেকে জ্ঞান বাক্য খৈর মতো ফোটে। সাধারণত মিষ্টিমুখ করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটত। অমুসলিম সমাজে হাতে খড়ি নামে একটি অনুরূপ অনুষ্ঠান করা হত। আজকাল বিসমিল্লাহ খানীর অনুষ্ঠান কদাচিৎ দেখা যায়।[৬] এ জাতীয় রীতি অভিজাত ও মধ্যবিত্ত উভয় সম্প্রদায়ের দ্বারাই অনুসৃত হত। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন পরিবারের বালকেরা সাধারণত ৫ কিংবা ৬ বছর বয়ঃক্রমকালে তাদের শিক্ষাজীবন শুরু করত। আরবি, ফার্সি ও অন্যান্য বিষয় ছাড়াও তাদেরকে নামাজ শেখানো হত। ৮ কিংবা ৯ বছর বয়সকালে তাদেরকে অশ্বারোহণ ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষার এই ধারা ১৩ কিংবা ১৪ বছর বয়সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকত।[৭]

সম্রাট আকবরের শিক্ষা-সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্য তালিকার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সম্রাট আকবর এক নতুন শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেন। এ সম্পর্কে আবুল ফজল বলেন- প্রত্যেক দেশে বিশেষত: হিন্দুস্তানে ছেলেদেরকে অনেকদিন স্কুলে রেখে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ শেখানো হয়। অনেকগুলি পুস্তক পড়তে দিয়ে ছেলেদের জীবনের এক বিরাট অংশ অপব্যয় করা হয়। মহামান্য সম্রাট (আকবর) আদেশ জারী করেন যে, প্রত্যেক স্কুলে বালক প্রত্যেকে প্রথমে বর্ণমালার অক্ষরগুলি লিখতে শিখবে এবং তৎসঙ্গে তাদের বিভিন্ন আকার প্রকৃতি ও নাম শিক্ষা করবে, আর তা দু'দিনে সম্পাদন করবে। অতঃপর সে যুক্তাক্ষর অনুশীলন করতে শুরু করবে। এটি এক সপ্তাহ ধরে অভ্যাস করবে। অতঃপর সে কিছু গদ্য ও পদ্য মুখস্ত করবে এবং তারপর স্রষ্টার গুণগান ও নৈতিকতামূলক কিছু বাক্য সে মুখস্ত করবে। তার পঠিত সমস্ত কিছু সে যাতে নিজে বুঝতে পারে সেদিকে সবিশেষ নজর রাখতে হবে, তবে শিক্ষক বোঝার ব্যাপারে তাকে কিছু সাহায্য করতে পারেন। অতঃপর তাকে দৈনিক কবিতার একটি লাইন, দু'লাইন নিজে নিজে লিখতে দেয়া হবে, এবং শীঘ্রই এ বিষয়ে সে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। শিক্ষক পাঁচটি বিষয়ের প্রতি নজর রাখবেন- অক্ষরের জ্ঞানলাভ, শব্দের অর্থ বোঝা, কবিতার এক লাইন, কবিতার দুই পংক্তি, পুরাতন পাঠ। এই শিক্ষা পদ্ধতি চালু হলে একটি বালক এক বছরে যা বুঝতে পারত তা সে একমাসে বা একদিনেও বুঝতে পারবে।[৮] নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় এবং তা সাম্রাজ্যের গর্বের বিষয়ে পরিণত হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা মসজিদ ও পবিত্র স্থানসমূহে (খানকাহ্, মাজার প্রভৃতি) পরিচালিত হত। কোরআন, হাদিস, ধর্মতত্ত্ব আইনশাস্ত্র, ইতিহাস এবং অন্যান্য ইসলামি বিষয়গুলো মাধ্যমিক পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। লৌকিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন- তর্কশাস্ত্র, অঙ্ক, জ্যামিতি, বীজগণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, ও অন্যান্য বিষয়ও মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষা দেওয়া হতো। সম্রাট আকবরের আমলের শিক্ষা সংক্রান্ত রেগুলেশনের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবুল ফজল তাঁর সময়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য বিষয়সমূহের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন "প্রত্যেকটি বালকের পক্ষে নীতিশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র, কারিগরিবিদ্যা, সংগীত, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন বিজ্ঞান ও ইতিহাস ইত্যাদি শেখা আবশ্যক। এর সবগুলো বিষয়ই পর্যায়ক্রমে আয়ত্ত করা যেতে পারে। সংস্কৃত শিখতে গিয়ে ছাত্রদের বৈয়াকরণ (ব্যাকরণ), নৈয়াই (ন্যায়শাস্ত্র), বেদান্ত, পতঞ্জলি ইত্যাদি অধ্যয়ন আবশ্যক। এ সমস্ত বিধি বিদ্যালয় সমূহের নতুন আলোকের সঞ্চার করে এবং মাদ্রাসাগুলোর দীপ্তি বৃদ্ধি করে।[৯] মাধ্যমিক স্তরের একজন ছাত্রকে উপরে বর্ণিত সব বিষয়ই অধ্যয়ন করতে হত না, প্রারম্ভে তাকে এসব বিষয় থেকে কয়েকটি নির্বাচন করতে হত। অতঃপর শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ে অগ্রসর হয়ে তারা এগুলো শিখতে পারত।

মসজিদ, মাদ্রাসা ও ইমামবাড়াগুলোতে উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হত। উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে অর্জিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল ব্যাকরণ, অর্থশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, সাহিত্য, আইনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান। পুরাতন বিষয়গুলির সঙ্গে মাদ্রাসায় উচ্চ শিক্ষিত পন্ডিতবর্গ আরও আধুনিক বিষয়াদি সংযোজন করেন।[১০] এছাড়াও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে রসায়নশাস্ত্র ও চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। মুঘলভারতে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা উচ্চশিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবি ও ফারসি। আরবি ও ফারসি মাদ্রাসায় প্রদত্ত শিক্ষা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের ছিল। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সমস্ত বিষয় পড়ানো হত না। ছাত্ররা যারা যা পড়তে

চাইত তা তারা বেছে নিত। আরবি বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়সমূহ ছিল ব্যাপক। মুঘল ভারতের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বৃটিশ পূর্ব যুগ পর্যন্ত ধাপে ধাপে আরবি মাদ্রাসসমূহে যেসব পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত ছিল, যুগের ক্রমানুসারে আবুল হাসানাত নদভী তা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক বিষয়ের পাঠ্যগ্রন্থ সমূহের নামও উল্লেখ করেন।

প্রথম যুগঃ খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম যুগে যেসব গ্রন্থ পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল তা হল- নাহ্ব (বাক্যপ্রকরণ ও শব্দের শেষ অক্ষরের স্বরচিহ্ন নির্ণয়শাস্ত্র): মিসবাহ্, কাফিয়া্, লুব্বুল আল্বাব, ইর্শাদ; ফিক্হ: হিদায়াহ্; উসূল-ই-ফিকহ্ (ফিক্হ এর মূলনীতি) : মানার ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহ, উসূল-ই বায্দাবী; তাফসির (কুরআন ব্যাখ্যা): মাদারিক, বায়যাবী, কাশ্শাফ; তাসাউফ (আধ্যাত্মিক বিদ্যা): আওয়ারিফ, ফুসুসূল হিকাম, নাক্দূন্ নুসূস, লামআত; হাদিস: মাশারিকুল আন্ওয়ার, মাসাবিহুস্ সুন্নাহ; মান্তিক (যুক্তিবিদ্যা): শর্হ্-ই শামসিয়াহ্; কালাম (ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত বিদ্যা): শর্ হ্ -ই সাহায়িফ, তামহীদ-ই-আবুশ্ শাকুর সালেমী; সাহিত্য : মাকামাত-ই-হারীরী। **দ্বিতীয় যুগ :** ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয় যুগের পাঠ্যসূচি ছিল অনেকটা প্রথম যুগেরই অনুরূপ। তবে এসময় পান্ডিত্য লাভের মাপকাঠিকে আরো উন্নত করা হয়। এ যুগে পূর্ববর্তী যুগের পাঠ্যসূচির সঙ্গে কাযী আযুদ রচিত 'মাতালি', 'মাওয়াকিফ' ও সাক্কাফি রচিত মিফতাহুল উলুমও পাঠ্যভুক্ত করা হয়। এ ছাড়া ক্রমান্বয়ে 'শর্হ-ই-মাতালি', শর্হ-ই-মাওয়াকিফ, মুতও-উয়াল, মুখ্তাসারুল মাআনী, তাল্বীহ্, শর্হ্-ই-আকায়িদ-ই-নাসাফি, শর্হ্-ই-বিকায়াহ্ ও শর্হ্-ই-জামীও সংযোজিত করা হয়। **তৃতীয় যুগ :** খ্রীস্টিয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয় যুগে আরবি মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যতালিকায় কিছুটা নতুন সংযোজন করা হয় এবং ইসলামি তথা আরবি-ফার্সি শিক্ষার উন্নতি বিধান করা হয়। এ যুগের পাঠ্যতালিকা হচ্ছে- নাহ্ব: কাফিয়াহ্, শর্হ্-ই-জামি; মান্তিক: শর্হ্-ই-শামসিয়াহ্, শর্হ্-ই-মাতালি; দর্শন: শর্হ্-ই- হিদায়াতুল্ হিক্মাত; কালাম: শর্হ্-ই-আকায়িদ-ই-নাসাফি; ফিক্হ: হুস্সামী, তাওযীহ্, তাল্বীহ্-এর কিয়দংশ; বালাগাত (বাক্যালংকার শাস্ত্র): মুখ্তাসারুল্ মাআনী, মুতাও-উয়াল; জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্ক: কতক সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা; চিকিৎসা শাস্ত্র: আল-কানূন (সংক্ষিপ্ত সংস্করণ); হাদিস: মিশ্কাতুল্ মাসাবিহ্ (সম্পূর্ণ), শামায়েল-ই-তিরমিযী (সম্পূর্ণ), সহীহ্ বুখারী (কিয়দংশ); তাফসির: মাদারিক, বয়যাবী; তাসাওউফ্ : আওয়ারিফ, রাসায়িল-ই-নক্শ্বন্দিয়াহ্। **চতুর্থ যুগ :** চতুর্থ যুগের সূচনা হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে। চতুর্থ যুগের পাঠ্যসূচি পূর্বের পাঠ্যসূচির কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে প্রণীত হয়। এ সময়ে যেসব বিষয় ও গ্রন্থ মাদ্রাসাসমূহে পড়ানো হত তা নিম্নরূপ- সর্ফ (শব্দ প্রকরণ বিদ্যা): মীযান, মুন্শায়েব, সর্ফ-ই-মীর, পাঞ্জ-ই-গাঞ্জ, যুব্দাহ্, ফুসূল-ই আকবরী, শাফিয়াহ্; নাহ্ব: নাহ্ব-ই-মীর, শর্হ্-ই-মিআত্ আমিল, হিদায়াতুন্ নাহ্ব, কাফিয়াহ্, শর্হ্-ই-জামী; মান্তিক: সুগ্রা, কুব্রা ঈসাগুজী, তাহ্যীব, শরহ ই-তাহ্যীব, কুত্বী, সুল্লমুল্-উলূম; হিকমাত: মায়বুযী, সদ্রা, শামস্, বাযিগাহ্; অঙ্ক: খুলাসাতুল হিসাব, তাহ্রীর-ই-অকলীদাস্ (প্রথম মাকালাত), তাশরীহুল আফ্লাক, রিসালা-ই-কুশ্ইজয়াহ্, শর্হ-ই-চগমনী (১ম অধ্যায়); বালাগাত: মুখ্তাসারুল্ মাআ'নী, মুতাও-উয়াল; ফিক্হ: শরহ্-ই-বিকায়াহ (১ম দুই খন্ড), হিদায়াহ্ (শেষ দুই খন্ড); কালাম: শরহ্-ই-আকায়িদ-ই-নাসাফী, শরহ্-ই-আকায়িদ-ই-জালালী, মীর-যাহিদ, শরহ্-ই-মওয়াকিফ্; তাফসীর: জালালাইন, বায়যাবী; হাদীস: মিশকাতুল মাসাবীহ্। **পঞ্চম যুগ :** পঞ্চম যুগ হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের পতনের যুগ (১৭৫৭-১৫৫৮)। উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের বাতি তখন ক্রমেই নিস্প্রভ হয়ে চলেছিল। এ পর্যায়ে যে পাঠ্যসূচি প্রনীত হয়েছে, মূলতঃ তা বিগত দরসে নিযামীর বিকৃত-পরিবর্তিত রূপ। তারপরও এখন পর্যন্ত এ পাঠ্যসূচিই প্রায় সকল মাদ্‌রাসায় প্রচলিত আছে। এ পাঠ্যসূচিতে নিম্নলিখিত বিষয় এবং কিতাবগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- সর্‌ফ: মীযান, মুন্‌শায়িব, পঞ্জ-ই-গাঞ্জ, যুব্‌দাহ দস্তুরুল মুব্‌তাদী, সর্‌ফ-ই-মীর, ইলমুস্‌ সীগাহ, ফুসুল-ই-আকবরী, শাফিয়াহ্‌; নাহ্‌ব: নাহ্‌ব-ই-মীর, মিআত্‌ আমিল, শর্‌হ-ই-মিআত্‌ আমিল, হিদায়াতুন্‌ নাহ্‌ব্‌, কাফিয়াহ, শরহ্‌-ই-জামী; বালাগাত: মুখতাসারুল মাআনী (সম্পূর্ণ), মতাও-উয়াল; সাহিত্য: নাফ্‌হাতুল ইয়ামন, সাব্‌আ-ই-মুআল্লাকাহ্‌, দীওয়ান-ই-মুতানাব্বী, মাকামাত-ই-হারীরী, হামাসাহ্‌; ফিকহ্‌: শর্‌হ-ই-বিকায়াহ্‌ (প্রথম দুই খন্ড), হিদায়াহ্‌ (শেষ দুই খন্ড); উসূল-ই-ফিক্‌হ: নূরুল আন্‌ওয়ার, তাওযীহ, তালবীহ, মুসাল্লামুস্‌ সুবত্‌; মান্‌তিক: সুগরা, কুবরা, ঈসাগুজী, কালা-আকুল, মীযান, মান্‌তিক, তাহ্‌যীব, শর্‌হ-ই-তাহ্‌যীব, কুত্‌বী, মীর কুত্‌বী, মুল্লা হাসান, হামদুল্লাহ, কাযী মুবারক, মীর যাহিদ, মীর যাহিদ এর উপর লিখিত গুলাম ইয়াহ্‌য়ার টীকা, মুল্লা জালাল, বাহরুল উলুম, শরহ-ই-সুল্লম, মীর যাহিদ এর উপর লিখিত আবদুল আলীর টীকা, শরহ্‌-ই-সুল্লম, মুল্লামুবীন; হিকমাত্‌: মীয়বুযী, সদ্‌রা, শামস্‌ বায়িযগাহ; কালাম: শর্‌হ্‌-ই-আকায়িদ-ই-নাসাফী, খিয়ালী, মীরযাহিদ; অঙ্ক: তাহ্‌রীর-ই-অক্‌লীদাস (প্রথম মাকালা), খুলাসাতুল হিসাব, তাস্‌রীহ্‌ শরহ্‌-ই-তাস্‌বীহ, শরহ্‌-ই-চগমনী; ফারায়েয: শরীফাহ; মুনাযারাহ্‌ (বিতর্ক বিদ্যা)ঃ রশীদিয়াহ্‌; তাফসীর : জালালাইন, বায়যাবী (সূরা-ই-বাকারাহ); উসূল-ই-হাদীস: শরহ্‌-ই-নুখবাতুল্‌ ফিক্‌র; হাদীস : বুখারী, মুসলিম, মুআত্তা, তিরমীযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবন-ই-মাজাহ। উল্লেখ্য এ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ।[১১]

উপরল্লিখিত পাঠ্যসূচি ছিল আরবি ভাষার সাথে সম্পৃক্ত। বলা চলে, এটা ছিল অনেকটা কলেজের শিক্ষার মত। মুসলিম শাসনামলে প্রাথমিক পর্যায়ে বা স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফার্সি ভাষা। কারণ, ফার্সি ছিল শাসক শ্রেণির মাতৃভাষা। তাই প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত ফার্সিতে। কাজ কারবারের ভাষাও ছিল ফার্সি।[৩২] সুতরাং ফার্সিতে যে সব গ্রন্থ পড়ানো হত তা নিম্নরূপ- **গদ্যে :** নুসখা-ই-তালীমিয়্যা, তা'লীমে আযীযী, দাসতুরুস সিব্‌ইয়ান্‌, ইনশা-ই-মাধুরাম, ইনশা-ই-ফায়েক, ইনশা-ই-খলীফা, রুকআত-ই-আলমগীরী, গুলিস্তা, আবুল ফযল, বাহার-ই-দানেশ, আনওয়ার সুহাইলী সে নস্‌রে যহুরী, ওয়াকায়ে নি'মত খান আ'লী এবং **পদ্যে :** করীমা, মুকীমা, খালিক বারী, বুঁস্তা, ইউসুফ জুলায়খা, কাসায়েদে উরফী, কাসায়িদে বদর চাচ, দীওয়ান-ই-গনী, সিকান্দার নামা ইত্যাদি গ্রন্থগুলো সাধারণতঃ পড়ানো হত।[১২] উল্লেখ্য, আরবি বিদ্যালয়ের ন্যায় ফারসি বিদ্যালয়ের বিষয়সমূহ এক একটি বিদ্যালয়ে এক এক প্রকারের ছিল। মুঘল শাসনামলে ভারত উপমহাদেশে আরবি ও ফার্সি মাদ্রাসা ছাড়াও কিছু মাদ্রাসা এমন ছিল যেখানে আরবি ও ফার্সি উভয় বিষয় পড়ানো হত। উদাহরণ স্বরূপ রাজশাহীর কসবা বাগ মাদ্রাসায় আরবি ও ফার্সি উভয় ভাষা পড়ানো হত।[১৩]

মুঘল শাসনামলে ভারত উপমহাদেশের মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এখনকার চাইতে অনেকটা স্বতন্ত্র ধরণের। আজকাল গোটা পাঠ্যসূচিকে যেমন কয়েকটি বাৎসরিক বা দ্বিবাৎসরিক বা ত্রৈবাৎসরিক শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় এবং সময়সীমা নির্ধারিত করে শিক্ষাকার্য পরিচালিত হয়, অতীতে তেমন কোন শ্রেণিবন্ধন বা বাঁধা-ধরা সময় সূচির অনুশাসন ছিল না। তখন পাঠ্য বিষয়গুলোর জন্য বাছাইকরা গ্রন্থ সমূহকে মানের দিক থেকে সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত করা

হত: উচ্চমানের গ্রন্থ, মধ্যমানের গ্রন্থ এবং নিম্নমানের গ্রন্থ। গ্রন্থমানের ক্রমানুসারে পাঠ্য বিষয়াদির প্রত্যেকটি থেকে এক বা একাধিক গ্রন্থের সমন্বয়ে ছাত্র জীবনের আদ্যোপান্ত পাঠ্যসূচিকে কয়েকটি গ্রুপ বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা হত। এক গ্রুপভুক্ত গ্রন্থ কয়েকটির অধ্যয়ন শেষ করা হলে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গ্রুপ বা শ্রেণিতে উত্তীর্ণ বলে পরিগণিত করা হত। এ শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা এখনো উপমহাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহে পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক শ্রেণিবন্ধন, বাৎসরিক বা দ্বিবাৎসরিক অধ্যয়নসূচি শিক্ষার্থীদের মর্জি মাফিক বিষয় নির্বাচন ইত্যাদি ইওরোপীয় সভ্যতারই অবদান।[১৪]

পুস্তক বিন্যাস / শিক্ষার পদ্ধতি কেমন ছিল? সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আবুল হাসানাত নদভী শাহ ওয়ালী উল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, শিক্ষা দানের ধারা হচ্ছে এই যে, প্রথমে আরবি ব্যাকরণের শব্দ প্রকরণ ও বাক্য প্রকরণের ছোট বই পড়তে হবে। ছাত্রের মেধা অনুপাতে তিন তিনটি বা চার চারটি বই পড়ানো যেতে পারে। এরপর ইতিহাস বা বাস্তব বিজ্ঞানের বই পড়াবে 'আরবিতে'। এসময় অভিধান থেকে কঠিন কঠিন শব্দ সমূহ খুঁজে বের করতে শিখাবে। আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জিত হলে ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াহ্ইয়া মাস্মূদীর বর্ণনায় মুয়াত্তা পড়াবে। এটা কিছুতেই ছাড়বে না। কারন আসল ইলম হচ্ছে হাদীস, এর পাঠে ফয়য আছে। এরপর কুরআন মজীদ শিক্ষা দিবে এমনভাবে যে, শুধু কুরআন শরীফ পড়বে তফসীর ছাড়া এবং তার তরজমা করবে। যেখানে ব্যাকরণের বা শানে নুযুলের দিক থেকে কোন অসুবিধা দেখা দেয় সেখানেই থেমে আলোচনা করে নেবে। অতঃপর এক এক পাঠ করে তফসীরে জালালাইন পড়বে। এতে অনেক ফয়য আছে। এরপর এক সময়ে একই সঙ্গে হাদীসের কিতাবগুলো পড়বে। যেমন সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম ইত্যাদি। এ সময়ে ফিকহ্ আকাইদ ও সুলূকের কিতাব পড়বে। একই সময়ে প্রজ্ঞা-বুদ্ধিমত্তার গ্রন্থাবলী যেমন শরহে মোল্লাজামী, কুতবী ইত্যাদি পড়বে যতদূর সম্ভব হয়। সম্ভব হলে একদিন মিশকাত এবং একদিন শরহে তীবী সমান অনুপাতে পড়বে। এভাবে পড়লে অনেক উপকার সাধিত হবে।[১৫]

পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে ছাত্রদের উপর কিছুই চাপিয়ে দেয়া হত না। তাঁদের নিজস্ব পছন্দ ছিল এবং তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয় চয়ন করতেন। ফলে সময় বা প্রতিভার অপচয় প্রায় ছিলনা বলা যায়। অমুঘলমানদের জন্য তাদের নিজস্ব জাতীয় গ্রন্থ পাঠ্যভূক্ত ছিল। তাদেরও মুঘলমানদের মত একইভাবে শিক্ষা প্রদান করা হত। এই শিক্ষা প্রদান করা হত তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে।[১৬] পঠিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেই সে অনুপাতে ছাত্রদের জন্য তিনটি উপাধি ছিল- ফাযিল, আলিম এবং কাবিল। এসব উপাধি দিয়ে বার্ষিক জলসায় তাদেরকে সনদ দেয়া হত। ১. মানতিক হিক্মতে বুৎপত্তিসম্পন্ন কিন্তু দীনিয়াতে সামান্য জ্ঞানের অধিকারী ছাত্ররা ফাযিল, ২. দীনিয়াতে সিদ্ধহস্তদেরকে আলিম, ৩. আরবি সাহিত্যে বুৎপত্তির অধিকারী ছাত্রদেরকে কাবিল লকব দেয়া হত।[১৭] এছাড়া ডিগ্রি প্রদানের সময় জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত এবং ছাত্রদের মাথায় ফজিলতের পাগড়ি বেঁধে দেয়া হত। শিক্ষা শেষ করে তারা মুনশী আখ্যা লাভ করত। শিক্ষা সমাপ্ত করে শিক্ষার্থীদের বেকার থাকতে হত না। যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে সরকারী চাকুরীও দেয়া হত।

গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। আওরঙ্গজেবের সময় বিষয় ভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করা হত। মিযান এবং মুনশাইব অধ্যয়নের জন্য দৈনিক এক এবং দুই আনা, যদি

কেউ শরহে বেকায়ার মত ফিক্‌হের বই অধ্যয়ন করে তাকে দৈনিক আট আনা বৃত্তি প্রদান করা হত। কাশ্‌শাফ এর ব্যাখ্যাকারী ছাত্রদেরকে পৃথকভাবে আর্থিক সহায়তা করা হত।[১৮] আলিম-উলামা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য দেয় এসব বৃত্তিকে সেকালের ঐতিহাসিক পরিভাষায় বলা হত মদদে-মা'আশ বা জীবিকা সহায়তা। সেকালের জীবিকা সাহায্যদানে হিন্দু-মুঘলমানের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হত না।[১৯]

শিক্ষার মাধ্যম ছিল সেদিনের রাজ ভাষা আরবি-ফারসি। কোরআনের ভাষা আরবি ছিল মুঘলমানদের জন্য আবশ্যক। এখনকার মত তখনও মুঘলমান সন্তানেরা কোরআনের মাধ্যমে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা করত। আবার সমগ্র মুঘলমান শাসনামলব্যাপী দরবারের এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ভাষা ছিল ফারসি। ফলে রাজসরকারে কিংবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকুরি লাভের জন্য ফারসি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করা অপরিহার্য ছিল। সাথে সাথে শহর ও গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য সংস্কৃত ও দেশীয় ভাষায় বিদ্যালয়ও চালু থাকে। উল্লেখ্য বাংলায় আরবি ও ফারসির পাশাপাশি বাংলাও ছিল। বাংলা ছিল বহু মুঘলমান ও অমুঘলমানদের মাতৃভাষা। ফলে বাঙালী মুঘলমানগণ বাংলা ভাষার শিক্ষা অবহেলা করতে পারেন নি।[২০]

এখনকার মত সেদিন পরীক্ষাই শিক্ষার শেষ বলে বিবেচিত হত না, অথবা ডিগ্রি ও ডিপ্লোমার প্রতি সেদিন তেমন ঝোঁকও ছিল না। কারণ সেদিন শিক্ষা গ্রহণ করা হত শিক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্যে। সেদিনকার শিক্ষা আজকের মত এত আত্মস্বীকৃতিমূলক নিয়মনীতির নিগড়ে আবদ্ধ ছিল না। কোনো বিশেষ পরীক্ষা পাশ করার জন্যে কোনো সময়সীমা যেমন ছিল না, তেমনি একখনকার মত এত পরীক্ষাও ছিল না। সেদিন শুধু একটি কর্মক্ষমতা পরীক্ষামূলক নিরীক্ষা হত। তার জন্যেও কোন বিশেষ রীতিনীতি ছিল না, যা আজো প্রতিটি আধুনিক ছাত্রের জন্য অনুকৃত হওয়া উচিৎ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এখন কোন ছাত্র প্রতি পাঁচটি প্রশ্নের অশুদ্ধ উত্তর দিলেও তাকে সক্ষম বলে ঘোষণা করা হয় এবং সে দ্বিতীয় শ্রেণি লাভ করে। প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে এ জাতীয় নিয়ম নিন্দনীয়। বরং সেদিনের শিক্ষক ছাত্রের দোষত্রুটি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর রাখতেন এবং তা নিরসনের জন্যে যত্নবান হতেন। সেদিন স্কুল বা কলেজে প্রমোশনের জন্যে মাসিক, শেষ বা বার্ষিক কোন পরীক্ষাই ছিল না। সেদিন কোন প্রশ্নপত্র বা উত্তরপত্র যেমন ছিল না, তেমনি একজন প্রশ্নপত্র তৈরি করে আর একজনের খাতা পরীক্ষা করার রীতিও ছিল না। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকই পরীক্ষা পরিচালনা করতেন এবং উচ্চতর শ্রেণিতে প্রমোশনের ব্যবস্থা করতেন। 'সনদ' (সার্টিফিকেট) বা বৃত্তি ছাড়াও মেধাবী ছাত্রদের ভেতর 'ইনাম' (পুরস্কার) ও 'তমঘার' (পদক) প্রচলন ছিল। মোটকথা পরীক্ষা রীতি ছিল সহজ-প্রদর্শনমূলক নয়, বরং অধিক সফলতামূলক।[২১] পরবর্তীতে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর মাসিক পরীক্ষার রীতি উদ্ভাবন করেন। পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে তাঁকে নিয়মিত অভিহিত করা হত।[২২] বৎসর শেষে জিলহজ্জ মাসে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত।[২৩]

মুঘল শাসনামলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ানোর পদ্ধতি ছিল– শিক্ষক ও ছাত্র সকলে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম বলে পাঠ শুরু করত। ছাত্ররা মেঝেয় বা বেঞ্চে পা আড়াআড়ি রেখে শিক্ষা গ্রহণ করত। শিক্ষকেরা বেদিতে বসে কলা ও বিজ্ঞানের উপর নানা প্রকার শিক্ষা প্রদান করতেন। হাদীস, তাফসীর, ফিকাহ, সাহিত্য, এমনকি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ কোন পারদর্শী আলিমকে ঘিরে বসত এক ধরনের বৃত্ত মজলিশ। যাকে বলা হত

"হালকা"। ছাত্ররা প্রথমতঃ শিক্ষকগণকে পূর্ব দিনের পাঠ সন্তোষজনক হলেই কেবল পাঠ দেয়া হত। বৃহস্পতিবারে নতুন কোন পাঠ দেয়া হত না। এ দিন পূর্ববর্তী দিন সমূহের পাঠ শিক্ষককে শোনানো হত। শিক্ষাদানের সময় ছিল সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এবং যোহরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।[২৪] প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুরা খাগরার কলমের সাহায্যে তখতির উপর লিখত। তখতি এখনকার স্লেটের মত। পাঠ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তা পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা যেত।[২৫] উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা বাঁশের কলম দিয়ে চীনা কাগজের উপর লিখত। এসব কাগজ অতি স্বচ্ছ, কিন্তু ইউরোপীয় কাগজ থেকে নিম্ন মানের।[২৬]

তৎকালে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রায়ই একত্রে বসবাস করতেন বলে তাঁদের মধ্যকার যোগাযোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন। কখনো কখনো একত্রে থাকার সুবিধা না থাকলেও তাঁদের যোগাযোগ অব্যাহত থাকত। তাঁদের সম্পর্ক ছিল পিতা ও পুত্রের ন্যায়। এই সম্পর্কের বড় প্রমাণ হল শিক্ষার জন্যে ছাত্রদের নিয়মিত টাকা দিতে হত না। বরং তারা বিনা খরচে শিক্ষকদের বাড়িতে থাকা ও খাওয়ার সুবিধা পেতেন। ছাত্রদের কাছ থেকে গভীর সম্মান প্রত্যাশা করা হত। শুধু তাই নয়, তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষকেরা ব্যক্তিগত সেবাও আশা করতেন। বিনিময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের সর্ব বিষয়ে পারদর্শী করে তোলা শিক্ষকদের নৈতিক দায়িত্বে পর্যবসিত হত।[২৭] মেধাবী ও প্রাগ্রসর ছাত্ররা তাঁদের শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারেও জড়িত থাকতেন। ক্লাশ নেওয়া, শৃঙ্খলা বিধান করা এবং পাঠ প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁরা শিক্ষকদের সাহায্য করতেন। এদেরকে বলা হত ছাত্র উপদেষ্টা। তখন অধ্যাপকদের সামনে পাঁচ দশজন ছাত্র শিক্ষা গহণ করত। অধ্যাপকগণ প্রত্যেক ছাত্রকে দেখাশুনা করার সুযোগ পেতেন।[২৮] শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হত। শিক্ষার্থীরা মাঝে মাঝে উপযুক্ত শিক্ষকের খোঁজে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে চলে যেত।

মুঘলভারতে শিক্ষকরা তাঁর ছাত্রদেরকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য সর্বোতভাবে প্রচেষ্টা করতেন। অনিয়মিত উপস্থিতি, পাঠ অমনোযোগ, পড়া তৈরী করতে না পারা, বেয়াদবী ও দুষ্টামীর জন্য শিক্ষার্থীদেরকে নানা ধরনের শারীরিক শাস্তি দেয়া হত। সেদিন প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রদের যে শাস্তি প্রদান করা হত তা আজকের ভারতীয় ছাত্ররা যা লাভ করছে তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। স্কুল পলানো বা অন্য অপরাধের জন্যে হাতে বেত মারা হত এবং মুখে চড় বসিয়ে দেয়া হত। কোড় বা চাবুক মারার নিয়মও ছিল। এছাড়াও ছাত্রের জন্যে যে কোন প্রকার শাস্তি উদ্ভাবন করার অধিকার শিক্ষকের ছিল।[২৯]

উপরে বর্ণিত নিয়মিত শিক্ষার বাহন ছাড়াও মুঘল শাসনামলে আড়ম্বরহীন ও রীতিবহির্ভুত পথেও একধরণের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হত। শিক্ষাবিস্তারে তার প্রভাবও কোন অংশে কম নয়। এখানে আড়ম্বরহীন ও রীতিবহির্ভূত শিক্ষার দ্বারা শিল্প এবং সুক্ষ কারুকাজের জন্য প্রায়োগিক গার্হস্থ্য শিক্ষাকেই বোঝানো হয়েছে। মুঘলভারতে বহু কারখানা বা শিল্প নির্মাণ কেন্দ্র ছিল, যেগুলো উৎসাহী ব্যক্তিদের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করত। তবে স্কুল ও কলেজের মতো বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে সর্বদা শিল্প ও কারিগরি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না। এ কারণে যাঁরা এসব শিখতে উৎসাহী তাঁদের নিজস্ব পছন্দমতো 'ওস্তাদের' ঘরে যেতে হতো, যাঁরা দক্ষ কারিগর ও শিল্পী।[৩০] বার্ণিয়ের বলেন- সূচিশিল্পী যে, সে তার পুত্রকেও সূচিশিল্পের শিক্ষা দেয়, স্বর্ণকার যে, সে তার পুত্রকে করে স্বর্ণকার এবং শহরের বৈদ্য যে, সে তার পুত্রকেও বৈদ্য করতে চায়।[৩১]

উল্লেখ্য শিল্প ও কারিগরি নৈপুণ্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। সাধারণত পিতা ছেলের এবং মাতা মেয়ের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। বালকেরা অনেক সময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কারিগরদের সঙ্গে কাজ শিখত। এভাবে সাধারণ কারিগরেরা বালকদের কাছ থেকে সাহায্য পেতেন যার বিনিময়ে তারা প্রভুর কাছ থেকে পেতেন পুরস্কার। কালক্রমে এসব বালক উৎকৃষ্ট কারিগরে পরিণত হত। এর জন্যে কোন নিয়মিত ফিস ছিল না, তবে কখনো কখনো মালিক বা বড় কারিগরকে উপহার প্রদানের রীতি চালু ছিল। এ জাতীয় শিক্ষানবিসির সময় কখনো কখনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানও হত। বালকেরা ছোটকাল থেকেই তাদের কাজ শুরু করত। প্রথমে তারা দোকানের সাধারণ ফাইফরমাস (যেমন যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা ইত্যাদি) খাটত, শেষে বাণিজ্যের ছোটখাট কাজ সম্পন্ন করত। প্রথম দিকে নির্দিষ্ট ও ছোটখাট নির্দেশ থাকলেও ধীরে ধীরে কলকব্জা নাড়াচাড়া করে এবং তার মিস্ত্রিদের কাজ দেখে তারা দক্ষতা অর্জন করত। তারা এ কাজে খানিকটা উন্নতি করতে পারলে তাদের সামান্য বেতন দেওয়া হত এবং সেটি ধীরে ধীরে বাড়ত। এভাবে তারা দক্ষ ও উপকারী শ্রমিকে পরিণত হয়। সবশেষে যখন তাদের প্রশিক্ষণ শেষ হয় তখন হয় তারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ কাজ করতে বেরিয়ে পড়ে, নয়তো তাদের প্রভুর দোকানে স্থায়ীভাবে কাজে লেগে থাকে। দরিদ্র কারিগরদের জন্যে এই নিয়মের সুবিধে হলো এই যে, তাঁরা তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের জীবিকার ব্যবস্থা করার সুযোগ পায় এবং তারা তাদের পিতামাতার বোঝা হয়ে থাকে না।[৩২] এছাড়াও মুঘল শাসনামলে আরও এক ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা দ্রুতবেগে এগিয়ে চলছিল যা গার্হস্থ্য শিক্ষা নামে পরিচিতি লাভ করে। এসময় একজন মোল্লাহ, মাওলানা বা মৌলবীর প্রতিটি গৃহ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। এসব বাড়িতে ছাত্রদের বিনামূল্যে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এজাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়াতে বলা হয়েছে- প্রাথমিক শিক্ষা মসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত স্কুলের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু সাধারণ শিক্ষা নিয়ম মত বাড়িতেই হত। অর্থসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ তাঁদের শিশুদের পড়া, লেখা ও অঙ্কের জন্যে শিক্ষক নিয়োগ করতেন। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ফারসি। বর্ণলিপি ও লিপি পদ্ধতির পুরস্কার ছিল অধিক। বড় বোর্ডের সাহায্যে শিশুদের লেখার পাঠ প্রদান করা হত। এই বোর্ডটি শিশুদের পাঠ্য পুস্তকের বড় সংস্করণের মত মনে হত, যা পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মুছে ফেলা যেত। সঙ্গতিহীন ব্যক্তিবর্গের শিশুদেরও এ জাতীয় বাড়িতে শিক্ষার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হত, যা অবশেষে ছোটখাটো একটি স্কুলে পর্যবসিত হয়। স্কুলগুলো গ্রাম্য 'মক্তব' এবং শিক্ষকেরা 'মৌলবি সাহেব' বা 'মুনসি সাহেব' হিসেবে পরিচিত। শিক্ষকতার পেশায় মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই নিয়োজিত থাকতেন।[৩৩]

এছাড়াও মুঘলভারতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে সাঁতার, দৌড়, বর্শা ছোড়া, লাফ, অসি চালনা, তীর চালনা, শিকার, ঘোড়ায় চড়া, রাইফেল চালনা, Mughal Military Salute উপস্থাপনা প্রভৃতি শেখানো হত। অবশ্য এগুলো অভিজাত পরিবারের সন্তান এবং সামরিক কর্মচারীদেরকেই শেখানো হত। মীর মুরাদ জুয়াইনি তীর চালনা এবং রাজা সালিভাহান দাখানি রাইফেল শুটিং শেখাতেন। চিত্র কলা শিক্ষার জন্যও আলাদা ব্যবস্থা ছিল। ইসলামের নিয়মানুযায়ী মানুষের প্রতিকৃতি আঁকা নিষিদ্ধ বিবেচিত হলেও আকবর একে বৈধ ঘোষণা করেন। আকবরের পর থেকে আওরঙ্গজেব ব্যতীত প্রায় সবাই চিত্রকলাকে উৎসাহিত করেছেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর হিরাটী চিত্রকর আকারিজার তত্ত্বাবধানে একটি চিত্রশালাও গঠন করেন। এ সময় হস্তাক্ষর বিদ্যারও বেশ

উৎকর্ষ সাধিত হয়। বাবর এবং হুমায়ুনের আমলে হস্তাক্ষর বিদ্যার চর্চা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নি। অবশ্য বাবর ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ 'বাবুরি' নামক নতুন ধরনের লিখন-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। আবুল ফজলের বিবরণ অনুযায়ী আকবরের আমলে প্রায় আট ধরণের লিখন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সম্রাটের সর্বাধিক প্রিয় লিখন পদ্ধতির নাম ছিল 'নষ্টালিক'। এটি অপর দুই পদ্ধতি 'নস্ক ও টালিক' এর সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল। জাহাঙ্গীর আকবরের মতই হস্তাক্ষরবিদ্‌দের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং সুলিখিত পাণ্ডু লিপির জন্য বেশি অর্থ দিতে দ্বিধা করতেন না। ঔরঙ্গজেব নিজেই সু-লেখনীর অধিকারী ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেব-উন-নিসা সুন্দর হাতের লেখা (ক্যালিগ্রাফী) শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিছুকালের মধ্যে তিনি 'শিকস' 'নশতালিক' ও 'নশখ' লেখায় দক্ষতা অর্জন করেন।[৩৪]

মুঘল শাসনামলে মুসলিম সমাজে কড়া পর্দাপ্রথার কারণে নারী শিক্ষা সর্বমহলে বিস্তার লাভ করেনি। শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহশিক্ষার প্রচলন থাকায় ছেলে-মেয়ে এক সাথে বসে শিক্ষা অর্জন করতে পারত। মেয়েদেরকে তখন নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাই দেয়া হত। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ তাদের জন্য ছিল না। তবে অভিজাত পরিবারের মেয়েদেরকে গৃহ শিক্ষক নিযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হত।[৪৯] বিদ্যা চর্চার জন্য বিশেষকরে মুঘল হারেমের মহিলারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সে যুগে পারস্য হতে শিক্ষিত মহিলারা ভারতবর্ষে আসতেন শিক্ষিকার দায়িত্ব নিয়ে। এঁদের পদবী ছিল "আতুন মামা"।[৩৫] তাদের পাঠ্যক্রমে ছিল ফার্সি, আরবি, ধর্মবিদ্যা, ইতিহাস, অঙ্ক ও মহাকাশবিদ্যা ইত্যাদি।[৩৬] নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। মুঘল যুগে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনো কোনো বাড়িতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার উল্লেখ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে হারেমের মহিলাদের পৃষ্ঠপোষকতারও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্কুল কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলা (সাধারণত পারস্য হতে আগত) দ্বারা পরিচালিত হত। কখনও কখনও কন্যার পিতা নিজে শিক্ষিত থাকলে তিনিই কন্যাকে কিছুটা জ্ঞান দানের ব্যবস্থা করতেন। দরিদ্র পরিবারের কন্যারা প্রায়ই অশিক্ষিত থাকত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য মসজিদের মোল্লা ও পাঠশালার পন্ডিত এরূপ দরিদ্র পরিবারের কন্যাদের মসজিদে ও পাঠশালায় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতেন। মহিলা পরিচালিত স্কুলগুলোতে গার্হস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হত। যেমন সূচের কাজ, কশিদা, রন্ধন প্রণালী ও অন্যান্য গৃহকর্মসংক্রান্ত বিষয়। তবে সাধারণ পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থা বহুবিস্তৃত ছিল না।

গুরুত্ব ও ফলাফল

মুঘল আমলে ভারত উপমহাদেশে মুঘলমানদের জ্ঞান চর্চার ধারা সম্পর্কে নির্ভূল, পরিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ধারণা লাভে আলোচ্য প্রবন্ধের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রবন্ধটি রচনার ফলে মুঘল ভারতে মুঘলমানদের শিক্ষার স্তর, শিক্ষাকেন্দ্র, পাঠ্যসূচি, বিজ্ঞানসম্মত পাঠ পদ্ধতি, সময়সূচি, লিখন পদ্ধতি, শ্রেণি পরিবর্তন, পুস্তক বিন্যাস, কারিগরি শিক্ষা লাভ, নারী শিক্ষা ও পাঠ্যসূচি প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সহায়ক হবে। মুঘল আমলের শিক্ষাব্যবস্থা এবং জ্ঞান চর্চা পঠন ও পাঠনের মাধ্যমে আধুনিক গবেষকগণ বর্তমান শিক্ষার পুনর্গঠনে কাজে লাগাতে পারবেন। তাছাড়া অত্র প্রবন্ধটি ছাত্র-শিক্ষক, ইতিহাসের পাঠক ও পরবর্তী গবেষকদের গবেষণা কর্মেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, মুঘল সাম্রাজ্যের দু'শ বছরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটা ক্ষেত্রে যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়েছিল তা সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্ভব হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই এই বিরাট প্রগতির পেছনে প্রেরণা জুগিয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রে মোগল সম্রাট, যুবরাজ ও অভিজাতদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা। এক্ষেত্রে উলেমা সমাজের ভুমিকাও কোন অংশে কম ছিল না। কেননা তাঁরা বিদ্যার উন্নতি ও শিক্ষাদান কাজে নিজেদের উৎসর্গ করে দেন এবং নিজেদের মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠানাদির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। মুঘল শাসনামলের শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি বিধানে তারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। অবশ্য এ কাজে মুঘল সম্রাটরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। মুঘল সম্রাটরা জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করায় এবং সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তিদের অত্যন্ত কদর থাকায় সমাজে শিক্ষার প্রতি ঝোঁক তৈরি হয়। সে সময়ের শিক্ষিত মহল সর্বদা জ্ঞানের চর্চা করতেন এবং নতুন নতুন পাঠপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। মুঘল শাসনামলের উন্নত, বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা চর্চার কারণেই সে সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিদের জন্ম হয়েছে। পরীক্ষাভীতি না থাকায় সে সময়ের শিক্ষার্থীরা কেবল জানার জন্য জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছিল। উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলো আবাসিক হওয়াতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একত্রে থাকার সুযোগ পেতেন, ফলে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কটাও অত্যন্ত মধুর ছিল। জ্ঞানার্জন নিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে একরকম প্রতিযোগিতা চলত। এখন যে অবস্থা আধুনিক শিক্ষাকে মলিন করে দিচ্ছে সেদিনকার শিক্ষা তা থেকে মুক্ত ছিল। সেদিনের শিক্ষা সত্যিকার বিদ্বান সৃষ্টি করত, যাঁরা সত্যানুসন্ধানে আত্মনিয়োগী ছিলেন। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারে যে, তখন যদি মুঘল শিক্ষা চর্চা ও পাঠপদ্ধতি এতই উন্নত থাকত তবে কেন আমরা পাশ্চাত্যের মত কালজয়ী প্রতিভার সাক্ষাৎ লাভ করি নাই এই দেশে? এরকম আরও বহু প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেই যুগের মাপকাঠিতে যদি বিবেচনা করা যায়, তাহলে দেখব এটি সেদিনের ছাত্রদের অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ ছিল। অন্ততঃ সেই যুগে মুঘল ভারতের মত উন্নত শিক্ষা, সভ্যতা এবং পাঠ পদ্ধতি মুসলিম বিশ্বের বাহিরে কোথাও ছিল না। এস.এম জাফর যথার্থই বলেছেন- সাধারণভাবে একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, পুরনো ভারতীয় স্কূল থেকে বেরিয়ে আসা ছাত্রদের শিক্ষা ছিল পূর্ণাঙ্গ এবং আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক তৈরী ম্যাট্রিকুলেট বা গ্র্যাজুয়েটদের শিক্ষা ভাসাভাসা ও ত্রুটিপূর্ণ।[৩৭] সুতরাং সেদিনের সেই উন্নত জ্ঞান চর্চা আজকের শিক্ষাবিদদের শিক্ষার পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রচুর সহায়তা করবে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুঘলমানস্*, অনুবাদ: আব্দুল মওদুদ (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৬), পৃ. ১৪১

২. এস. এম. জাফর, *মুসলিমশাসিত ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা*, অনুবাদ: রশীদ আল ফারুকী (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮), পৃ. ৯; Ashirbadi Lal Srivastava, *Medieval Indian culture*, (Agra: Shiva Lal Agarwala & Co.(p.) Ltd. 1964), p. 98

৩. ডক্টর এম. এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (১৫৭৬-১৭৫৭), দ্বিতীয় খন্ড, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ১৪৩-১৪৪

৪. কে.কে দত্ত, *আলীবর্দী এ্যান্ড হিজ টাইমস* (কলকাতা, ১৯৩৯), পৃ. ২৩৮

৫. ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুঘলমান* (১৭৫৭-১৮৫৬), অনুবাদ: দিলওয়ার হোসেন (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮২), পৃ. ১৬৭; কে. এম আশরাফ, *হিন্দুস্তানের জন-জীবন ও জীবন চর্যা* (ঢাকা: পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৮০), পৃ. ১৯৯ ; ডক্টর এম.এ.রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৫; এম.এস.এম আব্দুল কাদের রহমানী, *ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি বিস্তারে মকতবের ভূমিকা* (ঢাকা: ইফাবা, ১৯৮২), পৃ. ৯৪

৬. আব্দুল হক ফরিদী, *মাদ্রাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ৩০-৩১, ডক্টর এম.এ.রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৬; এস. এম. জাফর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯১-৯২

৭. ডক্টর এম.এ.রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৬

৮. *Ain-i-Akbari*, tr. Blockman. Vol. II, pp. 278-279

৯. *Ain-i-Akbari*, tr. Blockman. Vol. II, pp. 278-279

১০. *Imperial Gazetteer of India*, Bengal, Vol (1), (কলকাতা ১৯০৯), পৃ. ৪০৮

১১. আবুল হাসানাত নদভী, *ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র*, অনুবাদ: গোলাম সোবহান সিদ্দিকী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ৯১-৯২

১২. *তদেব*, পৃ. ১০৬

১৩. উ.এ্যাডম, *Report on the state of education in Bengal* (1935-1938) 2nd Report, (কলকাতা, ১৯৪১), পৃ. ১৬৩

১৪. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬), পৃ. ১০

১৫. আবুল হাসানাত নদভী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪

১৬. এস. এম. জাফর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১-১২

১৭. আবুল হাসানাত নদভী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৪-৯৫; Ashirbadi Lal Srivastava, *Ibid*, p. 108

১৮. G.M.D. Sufi, M.A.L.T Shaikh Muhammad Ashraf, *Al-Minhaj*, being the evolution of curriculum in the muslim Educational institutions of Indo-Pakistan subcontinent. (Lahore, 1941), pp. 63-64

১৯. আবুল হাসানাত নদভী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৬

২০. ডক্টর এম.এ.রহিম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২৬

২১. এস.এম. জাফর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩; N.N. Law, *Promotion of learning in India*, (Dhaka : Repub, 1973), p. 99; Ashirbadi Lal Srivastava, *Ibid*, p. 108

২২. আবুল হাসানাত নদভী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১ ; এস.এম. জাফর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯

২৩. আবুল হাসানাত নদভী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১

২৪. *তদেব*, পৃ. ২৮

২৫. এস.এম. জাফর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

২৬. আবুল হাসানাত নদভী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১; এস.এম. জাফর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯০

২৭. এস.এম. জাফর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২-৩

২৮. আব্দুস সাত্তার, আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, অনুবাদ: মোস্তফা হারুন (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ৩৫

২৯. এস.এম. জাফর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪

৩০. *তদেব*, পৃ. ১২৪

৩১. বিনয় ঘোষ, *বাদশাহী আমল*, ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়েরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত Travels in the Mogul Empire 1656-1668 A.D অবলম্বনে (কলকাতা: সিগনেট বুকশপ, ১৮৭৯ শকাব্দ), পৃ. ১৩৫

৩২. এস.এম. জাফর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৩-১২৪

৩৩. *Imperial Gazetteer of India*, Bengal, Vol (v), পৃ. ৪০৮

৩৪. শাহরিয়ার ইকবাল, *মোগল সমাজ ও রাজনীতিতে নারী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৯৫

৩৫. *তদেব*, পৃ. ১৭

৩৬. *তদেব*, পৃ. ১৭

৩৭. এস.এম. জাফর, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬